আমাদের পরিবেশ

(পঞ্চম শ্রেণি)

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর । পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩

তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ' আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' -এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে পঞ্চম শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমাদের পরিবেশ' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৬

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কলে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তকে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। পঞ্চম শ্রেণি-র 'আমাদের পরিবেশ' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৬

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)   অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ড. দেবব্রত মজুমদার   ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য   ড. সত্যকিংকর পাল   ড. সন্দীপ রায়   অনির্বাণ মণ্ডল

দেবাশিস মণ্ডল   সুব্রত হালদার   সঞ্জয় বড়ুয়া   রুবি সরকার   তপন কুমার গোস্বামী

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক এ.কে. জালালউদ্দিন   শিরীণ মাসুদ   ড. দেবীপ্রসাদ দুয়ারী

অধ্যাপিকা মিতা চৌধুরী   পার্থপ্রতিম রায়   রুদ্রনীল ঘোষ

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস   ড. ধীমান বসু   সুদীপ্ত চৌধুরী

দেবব্রত মজুমদার   নীলাঞ্জন দাস   ড. শ্যামল চক্রবর্তী

অধ্যাপক সুমন রায়   প্রদীপ কুমার বসাক

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সমীর সরকার

প্রচ্ছদলিপি : দেবব্রত ঘোষ

সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : সুব্রত মাজী

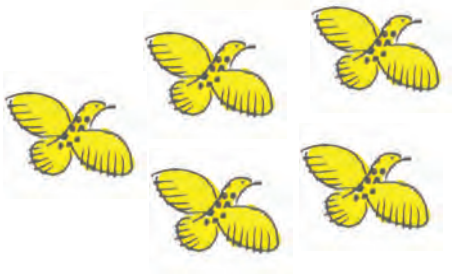

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানবদেহ	১-৪৬
ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল, জীববৈচিত্র্য)	৪৭-১৪৪
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি	১৪৫-২০৩
পরিবেশ ও সম্পদ	২০৪-২৩৫
পরিবেশ ও উৎপাদন (কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন)	২৩৬-২৯০
পরিবেশ ও বনভূমি	২৯১-৩১১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিবেশ, খনিজ ও শক্তি সম্পদ	৩১২-৩৩৮
পরিবেশ ও পরিবহণ	৩৩৯-৩৬৩
জনবসতি ও পরিবেশ	৩৬৪-৩৮৭
পরিবেশ ও আকাশ	৩৮৮-৪২০
মানবাধিকার ও মূল্যবোধ	৪২১-৪৪৫
আমার পাতা	৪৪৬-৪৪৭
পাঠ্যসূচি ও নমুনা প্রশ্ন	৪৪৮-৪৬৩
শিখন পরামর্শ	৪৬৪-৪৬৭

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রাণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

"ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। ...একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে এই 'পাঠ্যপুস্তক' তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশা শিশু 'আনন্দের সহিত' এ-বই পড়বে। তাদের নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা (কথা বলাবলি) করতে বলা হয়েছে তা 'আনন্দের সহিত' করবে। শ্রেণিকক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের কোলাহল ক্রমে তাদের আনন্দময় দলগত আলোচনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে। পাড়ায় ও অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করবে 'আনন্দের সহিত'।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে **"Intelligent guessing must be encouraged as a valid pedagogic tool. Quite often children have an**

idea arising from their everyday experiences, or because of their exposure to media, but they are not quite ready to articulate it in ways that a teacher might appreciate it. It is in this 'zone' between what you know and what you almost know that new knowledge is constructed. Such knowledge often takes the form of skills, which are cultivated outside the school, at home or in the community. All such forms of knowledge must be respected"

বাড়ির ও পাড়ার শিক্ষিত মানুষদের কাছে তো বটেই, অনেকসময় অনেক নিরক্ষর কাছের মানুষদের থেকেও তারা ধারণা (idea) পাবে। তার আগে ও পরে 'আনন্দের সহিত' এই বই পড়ার ফলে তাদের নতুন জ্ঞান-গঠন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। এর ফলে শুধু তাদের 'পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি' পেতে থাকবে এমন নয়, আত্মবীক্ষণ ও পরিবেশবীক্ষণ বিষয়ে তাদের 'গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকবে।

তবে এত কিছু হঠাৎ হবে না। শিক্ষিকা ও শিক্ষক, অভিভাবিকা ও অভিভাবকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

হয়তো এরপর আর শিখন-পরামর্শ দরকার হবে না। তবু আমরা জানি, এই পথে আমরা সবাই প্রথম চলতে চাইছি। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এপথে চলার কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানা নেই। তাই কিছু শিখন-পরামর্শ বইয়ের শেষে দেওয়া হল। আপনারাও ভাববেন, জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাব যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম ....

আমার মায়ের নাম ....

আমার বাবার নাম ....

আমার রোল নম্বর ....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম ....

....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম ....

আমাদের জেলার নাম ....

শরীরের বর্ম

ব্যাগ কিনতে সুজয় দোকানে গেছে। গিয়ে দেখা হয়ে গেল অণিমা আর ওর মা-এর সঙ্গে। দোকানদার বলছেন— ব্যাগ, জুতো ও বেল্ট সবই চামড়ার। তবে আজকাল চামড়ার অনেক বিকল্পও ব্যবহার হচ্ছে। মানুষও চামড়ার ব্যবহার কমাচ্ছে।

অণিমা ব্যাগটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল— চামড়া এত পুরু হয়?

পিছন থেকে সুজয় বলল— হ্যাঁরে, হয়। গন্ডারের চামড়া আরও পুরু!

পরদিন স্কুলে এসব বলল ওরা। দিদিমণি সব শুনে বললেন— জানো তো একসময়ে চামড়ার অনেক রকম ব্যবহার হতো। পশুর চামড়া শুকিয়ে তাতে লিখত মানুষ।

চামড়ার পোশাক, জুতো ব্যবহার করত। জল নিয়ে যেতে চামড়ার তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করত। তারপরে মানুষ বোঝে চামড়া বেশি ব্যবহারের বিপদ আছে। পশুরা তো মারা পড়েই। তার সঙ্গে চামড়ার বেশি ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হয়। চামড়া কারখানার নোংরা পড়ে জল নষ্ট হয়। হাওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়ায় চামড়ার কারখানা থেকে। তাই আস্তে আস্তে চামড়ার ব্যবহার কমাতে হয়েছে।

রিনা বলল— শরীরে কোনো জায়গার চামড়া টান টান। কোনো জায়গার চামড়া কোঁচকানো। আবার কোথাও চামড়া পুরু, কোথাও পাতলা।

দিদিমণি জানতে চাইলেন— আমাদের শরীরের বর্ম কোনটা বলো তো?

সুজয় বলে উঠল— আমাদের চামড়া।

— ঠিক বলেছ। চামড়া বা ত্বক। তার নীচে শরীরের সবকিছু। মাংসপেশি, নার্ভ, শিরা-ধমনি।

পরাণ বলল— দিদি, বর্ম কেন বলব?

সুজয় বোঝাল— আঘাত থেকে বাঁচায় বর্ম। ত্বকও তেমনি। বাইরের আঘাত ও সূর্যের আলোর অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায়।

—চামড়ার নীচে মাংসপেশি, শিরা-ধমনি রয়েছে। ত্বক এদের বাঁচায়। নইলে সামান্য আঘাতেই রক্ত পড়ত। জানত, অনেক দিন আগে যুদ্ধেও চামড়ার ব্যবহার হতো। গন্ডারের চামড়া দিয়ে পোশাক, ঢাল বানানো হতো। সেই পোশাক পরে যুদ্ধ করলে সহজে আঘাত লাগত না। তাই তাকে বর্ম বলা হতো। ঢালও শরীরকে আঘাত থেকে বাঁচাত। কোনো জায়গা ছড়ে গিয়ে ত্বকে আঘাত লাগলে রোগের জীবাণু সহজেই আক্রমণ করতে পারে।

মীনা বলল—শিরা-ধমনি সব নলের মতো, তাই না?

রফিক নিজের হাতদুটো উপুড় করে মীনাকে দেখাল। বলল— এই দেখ, কীরকম নল দেখা যাচ্ছে। চামড়ার নীচে ফুলে রয়েছে। নলগুলোর শাখাও রয়েছে।

— এগুলো শিরা না ধমনি?

— ওগুলো শিরা। ধমনি একটু ভিতর দিকে থাকে। শরীরের অনেক জায়গায় শিরাগুলো বেশ দেখা যায়।

দেখে নিয়ে লেখো

শরীরের কোন অংশের চামড়া কেমন তা দেখো। তা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো :

শরীরের অংশের	চামড়া কেমন	চামড়ার নীচে আর কী আছে বলে মনে হয়	চামড়ার নীচে শিরা দেখা যায় কিনা
গাল	টান টান		
গলা		দেখা যায়, নীল রঙের	
হাতের তালু			

ত্বক কোথায় পাতলা, কোথায় পুরু

পরদিন। দিদিমণি আসার আগেই ত্বক নিয়ে কথা শুরু হলো।

আমিনা নিজের হাতটা দেখছিল। একসময় বলল— চামড়া যেখানে পাতলা, সেখানেই শিরাগুলো দেখা যায়। চামড়া যেখানে মোটা সেখানে দেখা যায় না। তাই হাতের চেটোর দিকে শিরা দেখা যায় না।

সবাই নিজের নিজের হাতের দু-পিঠ দেখে নিল। আমিনা ঠিকই বলেছে। কিন্তু চামড়া কোথাও পাতলা কোথাও পুরু কেন?

সুজয় বলল— হাতের কোন দিকটায় বেশি ঘষাঘষি হয়?

মীনা বলল— চেটোর দিকটায়।

রফিক বলল— তাই কী হাতের চেটোর দিকের ত্বক মোটা হয়ে গিয়েছে?

ইতু বলল—পায়ের তলার চামড়া আরো পুরু। গোড়ালির কাছটা সবচেয়ে পুরু। গোড়ালিতে কি বেশি ঘষাঘষি হয়?

মীনা বলল—হাঁটার কথা ভেবে দেখ। গোড়ালির উপর শরীরের সব ভার পড়ে। সেখানে বর্মটা মোটা না হলে চলে?

এদিকে সুজন রফিকের হাতের চামড়াটা দু-আঙুল দিয়ে ধরল। বলল—এইভাবে ধরে দেখ, কোথাকার চামড়া কতটা পুরু বুঝতে পারবি।

দেখে নিয়ে লেখো:

শরীরের নানা অংশের ত্বক কত পুরু তা দেখো। তারপর লেখো :

শরীরের অংশ	ত্বক পাতলা না পুরু	শরীরের অংশ	ত্বক পাতলা না পুরু
গাল	পাতলা		

ত্বকের উপর-নীচ

স্কুলের কাছে এসে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল সুজন। হাঁটু আর কনুইতে লাগল। সবাই মিলে ধরে তুলে নিয়ে গেল। কনুইতে খানিকটা ছড়ে গেছে। এক জায়গায় একটু রক্ত বেরিয়েছে। হাঁটুতেও একটু ছড়েছে। একটু জল জল কিছু বেরিয়েছে। খানিকক্ষণ বরফ দেওয়া হলো। তারপর হেডস্যার ওষুধ দিলেন।

মীনা সব দেখছিল। সে ভাবল, ত্বকের কি দুটো স্তর আছে? একটা স্তরে জলের মতন কিছু থাকে? আর একটা স্তরে রক্ত? দিদি ক্লাসে এলে সে জানতে চাইল।

দিদি বললেন— ঠিকই দেখেছ। ত্বকের উপরের স্তরে রক্ত থাকে না।

রফিক বলল— ওইস্তরের উপরটা মরা। কেটে গেলেও কিছু হয় না। তাই না?

— হ্যাঁ, ভিতরের স্তরে আঘাত লাগলেই কিন্তু জ্বালা করবে।

মীনা বলল— পুড়ে গেলে খুব জ্বালা করে।

— তখন ঠান্ডা জল দিতে হয়। ধরো কবজির কাছটা পুড়েছে। খানিকক্ষণ ঠান্ডা জলে হাত রেখেছ। হাত তুললে আবার জ্বালা শুরু হলো। তাহলে আবার হাতটা ঠান্ডা জলে ডোবাতে হবে। যখন হাত তুলে নিলে জ্বালা করবে না তখন হাত তুলে নেবে। তাহলে চামড়ার ভিতরের স্তরে ক্ষতি হবে না।

—ফোসকা পড়ে যাবে যে!

— চামড়ার ওপরের স্তরটা গরমে মরে যায়। তখন নীচের স্তরটা থেকে জল বেরিয়ে আসে। দুটি স্তরের মাঝে সেই জলীয় তরল জমা হয়। তার ফলে জায়গাটা ফুলে ওঠে। এভাবে ফোসকা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় ঠান্ডা জল দেওয়া হলে নীচের স্তরটা গরম হতে পারে না। তখন ফোসকা নাও পড়তে পারে।

মীনা বলে উঠল— কিন্তু ফোসকা পড়লেও বেশি ক্ষতি নেই। তাতে চামড়ার ভিতরের স্তরটা বেঁচে যায়।

— বেশি পুড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

বলাবলি করে লেখো:

আগে কবে কার চামড়ায় আঘাত লেগেছে তা ভেবে আলোচনা করে লেখো :

শরীরের অংশ	চামড়ায় আঘাতের কারণ	তখন কী করেছ	এরপর ওই রকম হলে কী করবে

কোঁকড়ানো আর কালো

স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে এসেছেন আগের হেডস্যার। বয়স্ক মানুষ। পিনাকী দেখল, তাঁর মুখের চামড়ায় টানটান ভাব নেই। কপালের চামড়ায় ভাঁজ। পরদিন ক্লাসে স্যারকে এর কারণ জানতে চাইল।

স্যার বললেন— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বাড়লে চামড়াও বাড়ে। মোটা হলেও তাই। বৃদ্ধ হলে শরীরটা ছোটো হতে শুরু করে। কিন্তু চামড়া কমে না। তখন চামড়া কুঁচকে যায়। হেডস্যারের তাই হয়েছে।

রিয়াজ বলল— আচ্ছা স্যার চামড়ার রং কেন আলাদা হয়?

—মেলানিন নামের একটা জিনিসের জন্য চামড়ার রং কালো হয়। অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসার ঘটায়। মেলানিন অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে ক্যানসার আটকায়।

— তাহলে কালো চামড়া রোগের বিরুদ্ধে বেশি লড়াই করতে পারে?

— ঠিক তাই। আর রোদ শরীরে মেলানিন তৈরি করতে সাহায্য করে।

— সাহেবরা তো খুব ফর্সা। তাদের চামড়ায় মেলানিন নেই?

— আছে। তবে কম।

মীনা বলল— আমার বড়োজেঠুর গায়ের রং কালো। কিন্তু এখন অনেক জায়গায় চামড়াটা একদম সাদা হয়ে যাচ্ছে।

— ওসব জায়গায় মেলানিন তৈরি হচ্ছে না। অপুষ্টি বা অসুখে এমন হয়।

— তাহলে গায়ে রোদ লাগানো ভালো?

— হ্যাঁ। ত্বকে রোদ লাগালে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়।

স্বপন বলল — স্যার, চামড়া থেকে তো ঘাম বেরোয়।

— ঘামে নুন আর শরীরের কিছু বর্জ্য থাকে। বর্জ্য বেরিয়ে যাওয়াটা ভালো। নুন বেরিয়ে যাওয়াটা খারাপ। বেশি নুন বেরিয়ে গেলে মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে।

রিয়াজ বলল— চাচার খুব ঘাম হয়। ডাক্তারবাবু বলেছেন, একটু নুন জল খেতে।আজ তার কারণটা বুঝলাম।

— তবে জানত, একসময়ে চামড়ার রং দেখে মানুষের ভেদাভেদ করা হতো। বলা হতো, সাদা চামড়ার মানুষরা নাকি সভ্য। কালো চামড়ার মানুষরা নাকি অসভ্য। কালো

চামড়ার মানুষরা নিজেদের সম্মানের জন্য অনেক লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তারা নিজেদের সম্মান আদায় করেছে। নেলসন ম্যান্ডেলা, মহাত্মা গান্ধি, মার্টিন লুথার কিং এঁরা সবাই কালো মানুষদের সম্মানের জন্য লড়েছেন। চামড়ার রং দেখে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করা আজকের দিনে অপরাধের শামিল।

বলাবলি করে লেখো

চামড়ার অসুখ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো :

শরীরের অংশ	চামড়ায় কী অসুখ হয়	সেই অসুখের লক্ষণ	সেই অসুখ হলে কী করেছ বা করবে

চুলের সাতকাহন

কৌশিকের মা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। চিরুনিতে কিছু চুল উঠে এল। কৌশিক দেখল, চুলের গোড়াগুলো মোটা। ভাবল, চুলের গোড়াগুলো মাথার কোথায় আটকে থাকে? চামড়ার উপরের স্তরে? নাকি ভিতরের স্তরে? নাকি আরও গভীরে?

অনেক প্রাণীর আবার গায়ে লোম বেশি। কিন্তু মাথায় চুল নেই। পাখির গায়ে পালক থাকে। মাছের আছে আঁশ। সাপেরও তাই। আবার ব্যাঙের গায়ে আঁশ, পালক বা লোম কিছুই নেই।

স্কুলে যেতে যেতেই ওরা বন্ধুরা এসব কথাই বলছিল। তৃষা বলল— মুরগির গায়ে কিছু পালক খুব ছোটো। লোমেরই মতো। ওগুলোর গোড়াগুলো চামড়ার নীচের স্তরে সেটা বোঝা যায়।

ক্লাসে এসব কথা বলল সবাই মিলে।

দিদিমণি তৃষার দিকে তাকালেন। হেসে বললেন— তুমি এত সব জানলে কী করে?

—মুরগির গায়ে ওষুধ লাগাতে গিয়ে দেখেছি।

—লোম, চুল,পালক সবেরই গোড়া চামড়ার ভিতরের পর্দায়। চামড়া তো শরীরকে বাঁচায়। আবার চামড়াকেও প্রথম ধাক্কা থেকে বাঁচাতে হবে। তাই লোম, চুল, পালক, আঁশ তৈরি হয়েছে।

তৃষা বলল— মাথা আঁচড়াতে গেলে তো রোজই কিছু চুল উঠে যায়!

— ওঠে তো! পালক, লোম, চুল সবই ওঠে। চামড়া আবার তা তৈরি করে নেয়। তবে রোজ বেশ কিছু চুল স্বাভাবিক নিয়মেই পড়ে যায়।

নবীন বলল— বয়স বাড়লে চুল সাদা হয়ে যায় কেন?

— বয়স বাড়লে মেলানিন তৈরি কমে যায়।

রিনা বলল— কারো চুল কোঁকড়ানো, কারো কোঁচকানো, কারো সোজা!

— দেখো তো তোমাদের মধ্যে কতজনের চুল কেমন। খুঁজলে দেখা যাবে বিভিন্ন মানুষের চুলের রং ও ধরন তোমাদের থেকে অনেকটা আলাদা।

দেখেশুনে লেখো

তোমাদের কার চুল কেমন, কার কত চুল ওঠে তা দেখে আর গুনে লেখো :

চুলের ধরন		গড়ে দিনে নিজের কটা চুল উঠে যায়			
চুলের ধরন	কোন ধরন, কতজনের	দিন সংখ্যা	সারাদিনে কটা চুল পড়ল	চারদিনে মোট কত চুল পড়ল	গড়ে দিনে কটা চুল পড়ল
কোঁকড়ানো		১			
একটু কোঁচকানো		২			
সোজা সোজা		৩			
		৪			

শজারুর কাঁটা

নীলা কোনো পশুর মাথায় মানুষের মতো চুল দেখেনি। বিড়ালের গোঁফ আর ছাগলের দাড়ি দেখেছে। ওদের গোঁফ-দাড়ি কি মানুষেরইমতন? ওদের গোঁফ-দাড়ি কি পাকে? রিনাকে বলল এসব।

রিনা বলল—ওদের গোঁফ-দাড়ি বেশি বাড়ে না।

ওদের এসব কথা শুনে সুনীল বলল— চুল-গোঁফ-দাড়ি সবার সমান বড়ো নয়। কারো কম বাড়ে, কারো বেশি বাড়ে।

ক্লাসে এসব বলল ওরা। দিদিমণি বললেন — সুনীল তো ঠিকই বলেছে।

সাবিনা বলল—দিদি, কাকাতুয়ার ঝুঁটি কি চুল?

--- দেখতে চুলের মতো হলেও পালকই। ওইরকম ঝুঁটির মতো হয়ে তৈরি গন্ডারের খড়্গা। আসলে সেটা চুল।

— চুল কী করে হবে? খড়্গা তো শুনেছি খুব শক্ত।

— শক্ত হলেও জমাট বাঁধা চুল। লোমও শক্ত হয়। বলত কোন প্রাণীর গা-ভরতি শক্ত খাড়া খাড়া লোম?

রফিক বলল— শজারু। শজারুর লোম কাঁটার মতো। খুব শক্ত আর সূঁচাল হয়।

সুনীল বলল — বাদুড়ের গায়েও লোম আছে।

বলাবলি করে লেখো

মানুষের ও অন্য প্রাণীর লোম-চুল বিষয়ে আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো:

মানুষের লোম-চুল		অন্য প্রাণীর লোম/চুল/পালক/আঁশ			
কাটলে বেশি বাড়ে কিনা		বেশি লোম কাদের	খুব কম লোম কাদের	বিশেষ ধরনের লোম-চুল কাদের	বিশেষ ধরনের পালক/আঁশ কাদের
না কাটলে কত বড়ো হয়					
চামড়ার কোন স্তরে গজায়					
এদের কাজ কী					
পাকলে কেন সাদা					

নখের নীচে রক্ত

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেল পুনম। নখ উলটে রক্ত বেরোলো। খানিকক্ষণ বরফ লাগাতে বললেন বড়দি।

তারপর ওষুধ দিলেন। বললেন— মাস দুয়েক পরে নতুন নখ গজাবে।

বিমল নখের নীচে রক্ত দেখে অবাক। সে ভাবত নখ কাটলে লাগে না। একথা শুনে নোরসাং বলল—কোনোদিন তোর নখ বেশি কাটা হয়ে যায়নি?

বিমল ভেবে বলল—একবার হয়ে গিয়েছিল। চামড়া কেটে যাওয়ার মতন লেগেছিল।

— আর একটু কাটলেই রক্ত বেরোত।

পিয়ালি বলল— নখের রং দেখ গোলাপি। এবার নখের একধার একটু টিপে দেখ।

বিমল তাই করল। গোলাপি রংটা একদিক থেকে অন্যদিকে

সরে গেল। তা দেখে বিমল বলল—ওই রংটা রক্তের জন্য! তাই না? রক্তটা অন্যপাশে সরে যাচ্ছে।

ক্লাসে ঢুকে পুনমের নখ উলটে যাওয়ার কথা শুনলেন দিদিমণি। বললেন—আঙুলকে বাঁচায় নখ। আবার আঙুলের অনেক কাজও করে নখ। নখ না থাকলে ছোটো জিনিস ধরা যেত না।

নোরসাং বলল—পায়ে কাঁটা ফুটলে নখ দিয়ে ধরে তুলতে হয়।

কৌশিক বলল— মাটিতে পিন পড়ে গেছে? নখ দিয়েই ধরে তুলতে হবে।

পুনম বলল— আমার মায়ের নখগুলো ফেটে ফেটে গেছে।

—এটা রক্তাল্পতার কারণে হতে পারে। রক্তাল্পতার জন্য নখের মাঝখানটা চামচের মতো হয়ে যেতে পারে। নখটা ফ্যাকাশেও হয়ে যেতে পারে। দেখবে ডাক্তাররা রোগীর নখ দেখেন।

রিনা বলল— নখের গোড়ায় নোংরা হলে পেকে যায়। পুঁজ হয়।

—ঠিক। নখ পরিষ্কার রাখা ও কাটা খুব দরকার। নোংরা জমে থাকলেই সেখানে জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে।

বলাবলি করে লেখো

নখের কাজ, নখের যত্ন এসব নিয়ে আলোচনা করে লেখো :

নখ কী কী কাজ করে	নখ দেখে কী কী বোঝা যায়	কীভাবে নখের যত্ন করা দরকার

নরম নরম থাবার নীচে লুকানো তার নখ

সোনম ভাবছিল বিড়ালের নখের কথা। এমনিতে নখগুলো দেখাই যায় না। কিন্তু কিছু ধরার সময় বেরিয়ে আসে। বন্ধুদের সেকথা বলল। সিরাজ বলল—কুকুরেরও ওইরকম আছে।

কৌশিক বলল— কুকুরের ধারালো নখ আছে। কিন্তু তা থাবায় লুকানো থাকে না।

— ধারালো নখ অন্য অনেক জীবজন্তুর আছে।

— বেশিরভাগ পাখির নখই ধারালো।

— কেন বলত? ওরা নখ দিয়ে নানা জিনিস ধরে উড়ে যায় বলে?

— হতে পারে। হাঁস ওড়ে না। তাই হাঁসের পায়ে ওইরকম নখও নেই।

— পেঁচা, ঈগল শিকারি পাখি। ওদের নখ হুকের মতো। বাঁকানো আর সূঁচাল।

জন শুনছিল। এবার বলল— গোরু, ছাগলের নখই ওদের খুর। সেগুলো ভোঁতা। ওরা মাছ বা পোকা ধরে না। তাই ধারালো নখ নেই।

দিদিমণিকে এসব কথা বলল সবাই। দিদিমণি বললেন— ঠিক। শিকারি পশুপাখিদেরই ওইরকম নখ হয়।

পুনম বলল— দিদি, মানুষ ছাড়া তো কেউ নখ কাটে না। তবু পশুপাখিদের নখ কেন বেশি বাড়ে না?

— দেখোনি, অনেক পশুপাখি নখ ঘষে। ঘষে ঘষে নখ বাড়তে দেয় না।

— দিদি, ত্বক-চুল-নখ সবাই শরীরের অন্য অঙ্গকে বাঁচায়।

— তবে এদেরও যত্ন করতে হয়। সাবান, জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। তেল, ক্রিম লাগাতে হয়। নখের যত্ন না নিলে জীবাণু ঢুকে নখকুনি হয়। চামড়ায় ফুসকুড়ি, দাদ-হাজা, চুলকানি হয়। চুলে খুসকি, উকুন হয়।

বলাবলি করে লেখো

১। বিভিন্ন প্রাণীর নখ সম্পর্কে নিজেরা আলোচনা করে, ভেবে লেখো:

নখ নেই এমন প্রাণী	খুরওলা প্রাণী	কিছুটা ধারালো নখওলা প্রাণী	খুব সূঁচাল নখওলা প্রাণী
	গোরু	মানুষ	বিড়াল

২। নখ, চুলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো:

নখ, চুলে কী কী সমস্যা হয়	তাতে কী কী কষ্ট হয়	তখন কী করলে ভালো হয়

ছোটো-বড়ো হাড়ের কথা

স্যার সোহমকে ডেকে একটা নল ধরতে দিলেন। বললেন---এটা বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরো।

সোহম ধরল। স্যার সবাইকে বললেন--- আমাদের আঙুলগুলো দেখো। আঙুলে ক-টা জায়গায় ভাঁজ হয়েছে?

জাফর বলল — বুড়ো আঙুলে দুটো ভাঁজ। তর্জনীতে তিনটে।

জিকো বলল— দুটো আঙুলের গোড়া দু-জায়গায়।

রোকেয়া বলল — দু-জায়গা থেকে দুটো হাড় গেছে কবজিতে।

স্যার ওদের কথায় খুব খুশি হলেন। বললেন —ঠিক বলেছ। কবজি থেকে পাঁচ আঙুলে মোট ক-টা হাড়? গুনে নাও।

এই বলে স্যার একটা হাত আঁকলেন।

একটু ভেবে জিকো বলল— সারা গায়ে তো অনেক হাড়! কয়েক-শো হয়ে যাবে!

সোনাই বলল— সব হাড় কি এভাবে গোনা যাবে?

— তা না গেলেও এভাবে ধারণা করতে পারবে। হাড়ের মোট সংখ্যাটা একশোর কাছে, নাকি দুশোর বা তিনশোর।

অরূপ বলল— ঠিক ক-টা হাড় আছে তা কী করে জানা যায়?

—যেকোনো জীবের কঙ্কাল দেখে।

— মানুষের হাড়গুলো নানা মাপের। কনুই থেকে কবজি, কোথাও ভাঁজ নেই। কত বড়ো। আবার আঙুলের ডগার হাড় কত ছোটো।

অরূপ ডান হাতের বিভিন্ন জায়গা বাঁহাত দিয়ে টিপে দেখল। তারপর বলল— কিন্তু মানুষের কঙ্কাল দেখলে বোঝা যাবে কবজি থেকে কনুই দুটো হাড়। কিন্তু কনুই থেকে কাঁধ নলের মতন একটা হাড়।

— ঠিক। কোমর থেকে হাঁটু অবধি নলের মতো আরেকটা হাড় আছে। এভাবে হাত দিয়ে দেখো শরীরের কোথাকার হাড় কেমন।

দেখে বুঝে লেখো

বিভিন্ন জায়গার হাড়ের মাপ ও তাদের আকার বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করো। তারপর লেখো :

কোন জায়গার হাড়	মাপ (ছোটো / মাঝারি / বড়ো)	কোন জায়গার হাড়	মাপ (ছোটো / মাঝারি / বড়ো)

অস্থিসন্ধির হিসেবনিকেশ

হাড়ের সংখ্যা গুনতে গিয়ে নতুন এক খেলা শুরু হলো। হাড়ের জোড় ক-টা! জোড়গুলো না থাকলে বল ধরা যেত না। ক্রিকেট খেলায় স্পিনার বল ধরে মুচড়ে ছাড়ে। কবজি পর্যন্ত সব আঙুল কাজ করে। কবজি থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত ক-টা জোড়?

স্যার ক্লাসে এলে বল ধরার মতো করে আঙুল ভাঁজ করে দেখাল জন।

স্যার বললেন—হাড় হল অস্থি। জোড় হল সন্ধি। হাড়ের জোড়কে বলে অস্থিসন্ধি। সারা গায়ে কোথায় কোথায় অস্থিসন্ধি আছে? শরীরে হাত দিয়ে আর নরকঙ্কালের ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করো।

রঞ্জন বলল— এত হাড়। এদের আলাদা আলাদা নাম নেই?

খোপে কোথাকার হাড় কোনগুলো তা লেখো

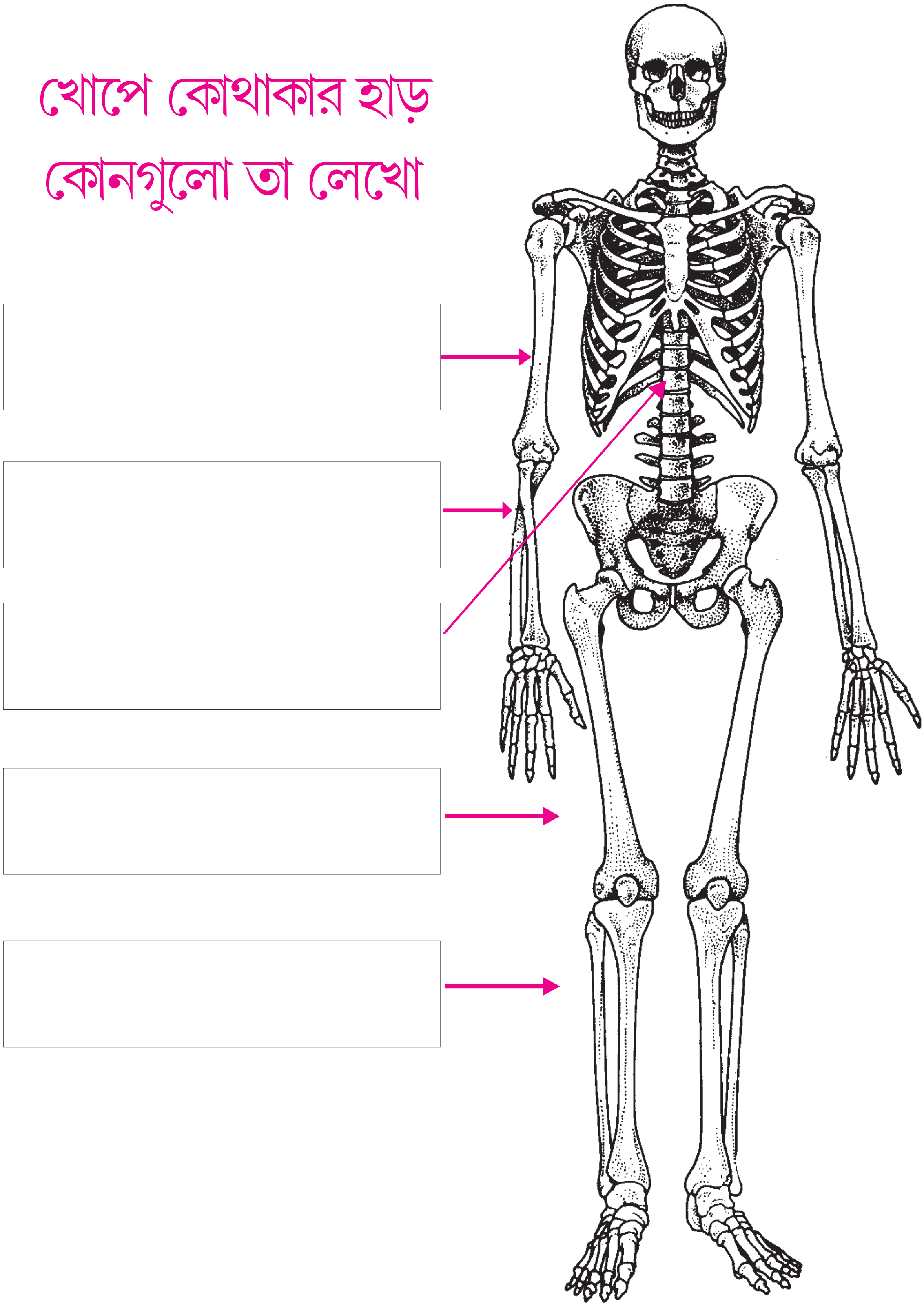

— আছে। কয়েকটা নাম বলছি।

কনুই থেকে কবজি : আলনা ও রেডিয়াস।

কাঁধ থেকে কনুই: হিউমেরাস।

মেরুদণ্ড : ভার্টিব্রা বা কশেরুকা।

কোমর থেকে হাঁটু : ফিমার।

হাঁটুর নীচ থেকে গোড়ালি : টিবিয়া ও ফিবুলা।

— হাড়গুলো অস্থিসন্ধিতে কী দিয়ে লাগানো থাকে?

—দড়ির মতো একরকম জিনিস। তাকে বলে লিগামেন্ট। কাঁধ, কোমর, হাত ও পায়ের অস্থিসন্ধির মাঝখানে একরকম হড়হড়ে তরল থাকে। সেটা কমে গেলে হাড়ের নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

রিনা বলল— জিমনাস্টিকস করলে অনেক অস্থিসন্ধি খুব নমনীয় থাকে।

— ঠিক। আর অস্থি মজবুত করার জন্য ক্যালশিয়াম দরকার। দুধ, ডিমে তা আছে।

দেখে আর গুনে লেখো

১। শরীরের হাড়ের বিষয়ে দেখে আর গুনে লেখো:

এক হাতে কাঁধ থেকে কবজির আগে পর্যন্ত হাড়ের জোড় ক-টা? গুনে খাতায় লেখো:	
কাঁধ থেকে কবজি পর্যন্ত ক-টা হাড়? শরীরে হাত দিয়ে আর নরকঙ্কালের ছবি দেখে গুনে লেখো :	

২। অস্থি মজবুত করা ও অস্থিসন্ধিগুলো নমনীয় করা বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

অস্থি মজবুত হলে কী সুবিধা	কী করলে অস্থি মজবুত হয়	অস্থিসন্ধি নমনীয় হলে কী সুবিধা	কী করলে অস্থিসন্ধি নমনীয় হয়

পেশি নিয়ে কিছু কথা

শুভ্রকে কাকা পাঞ্জা লড়তে শেখাচ্ছিলেন। শুভ্র কাকার হাত চেপে ধরে অবাক। ইটের মতো শক্ত! শুভ্র বলল— তোমার হাত এত শক্ত হলো কী করে?

— পেশির জন্য। কাজ করায় হাড়কে সাহায্য করে। পেশি হাড়ের এক জায়গায় শুরু। আর এক জায়গায় শেষ। এমনিতে নরম। টানটান করলেই শক্ত হয়ে যাবে। কিছু টানতে গেলে পেশির জোর চাই।

— কী করে পেশি জোরালো হবে?

— মাছ-মাংস, ডিম, মাশরুম, ডাল, সয়াবিন, লেবু খাবে। একটু ব্যায়াম করবে। মাঝেমধ্যে হাতটা টানটান করবে, তারপর ছেড়ে দেবে। পেশি লম্বায় বাড়বে।

স্কুলে এসব কথা বলল শুভ্র। স্যার বললেন— হাতে অনেক পেশি আছে। লিখতে গেলে অনেক পেশির সাহায্য লাগে। ক্রিকেট খেলায় বল করতে আবার অন্যরকম। দেখার জন্য, পড়ার জন্য চোখের পেশি কাজ করে।

অজন্তা বলল— অন্য প্রাণীদেরও দেহে পেশি আছে?

— নিশ্চয়ই। বাঘের মুখের পেশির জোর খু

পেশি খুব শক্তপোক্ত। কেঁচোর দেহের বেশিরভাগটাই শুধু পেশি।

—আমাদের হাড় না থাকলে কী হতো? চলাফেরা কেঁচোর মতো হয়ে যেত!

— তা বটে। আমাদের চোখে হাড় নেই। এর সঙ্গে লাগানো পেশিগুলো একে নড়াচড়া করায়। জিভও একটা পেশি। একাই

অনেক কাজ করে। কোনো খাবার চেটে নিতে পারে। মুখের ভিতর চিবানোর সময় খাবারকে ওলোট-পালোট করে নিতে পারে। আবার গিলতেও জিভের সাহায্য লাগে। আর জিভ না থাকলে কথা বলা যায় না। আবার কানের লতিতেও পেশি।

তবে সে কোনো কাজই করতে পারে না।

বলাবলি করে লেখো

মানুষ ও অন্য প্রাণীর শরীরের পেশি বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

মানুষের শরীরের পেশি		অন্য প্রাণীর শরীরের পেশি	
কোন জায়গার পেশি	কী করায় সাহায্য করে	কোন জায়গার পেশি	কী করায় সাহায্য করে
কাঁধের পেশি			
চোয়ালের পেশি			

স্টেথোস্কোপে শোনা

ডাক্তারবাবুরা বুকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখেন। সিধু ভাবল, অমন একটা জিনিস বানানো যায়? স্টেথোস্কোপের যে দিকটা বুকে ঠেকায় সেটা ছোটো ফানেলের মতো। ও একটা ফানেল আর রবারের নল দিয়ে স্টেথোস্কোপ বানাবার চেষ্টা করল।

ছোটোবোনের বুকে নলটা ঠেকিয়ে সিধু ফানেল কানে দিল। তারপর অবাক হয়ে শুনল। বুকে এত শব্দ হয়?

ভালো করে দেখার আগেই বোনকে মা ডাকলেন। বোন এক ছুটে চলে গেল। আবার একটু পরে ফিরে এল।

সিধু আবার এভাবে শুনল। এবার মনে হল শব্দটা বদলে গেছে।

পরেরদিন স্কুলে সবাইকে ও সেকথা বলল। দিদিমণি শুনে বললেন— ঠিকই শুনেছ। দৌড়ে গেলে আর দৌড়ে ফিরলে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দটা বেড়ে যায়।

আশা বলল- হৃৎপিণ্ড কী?

—শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার পাম্প। সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার জন্য ছড়িয়ে আছে ধমনি। পাম্প করে ওই নল দিয়ে রক্ত পাঠায় বুকের ভিতরের একটা অঙ্গ। তার নাম হৃৎপিণ্ড।

রবিলাল বলল- সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার দরকার কী?

— সারা শরীরে অক্সিজেন ও শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দেয় রক্ত। আবার ধরো, তোমার নাকে ফোঁড়া হয়েছে। সেখানে ফোঁড়ার অনেক জীবাণু। রক্তেও কিছু জীবাণু মিশেছে। কিন্তু তুমি ওষুধ খেয়েছ। ওষুধটা ফোঁড়ার জীবাণু মারতে পারবে। কিন্তু ফোঁড়ার কাছে ওষুধটা যাবে কীভাবে?

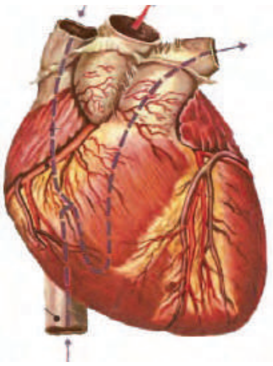

— রক্তের সঙ্গে গুলে যাবে? হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত পাম্প করে নাকে পাঠাবে?

— এই তো রক্তের কাজ আর হৃৎপিণ্ডের কাজ বুঝেছ। তাছাড়া, রক্তেও রোগ আটকানোর মতো অনেক কিছু থাকে।

— তাই কিছু অসুখ ওষুধ না খেলেও সেরে যায়!

— ঠিক। এবার তোমরা বন্ধুরা সবাই সিধুর মতো স্টেথোস্কোপ বানাতে চেষ্টা করো। ছোটার আগে-পরে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দের ছন্দ কীভাবে বদলায় তা দেখো।

দেখেশুনে ভেবে লেখো

স্টেথোস্কোপ বানিয়ে নানান কাজের পর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ শোনো। কোন কাজের পর সেই ধুকপুক শব্দের ছন্দ কীরকম হয় তা শুনে লেখো :

হৃৎপিণ্ডের শব্দ			অসুখ হলে রক্ত পরীক্ষা করে কেন
বিকালে খেলার পর	রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে	কেন ওই পরিবর্তন	

বাতাসে ওড়ে জীবাণু

রাস্তায় খুব ধুলো। কাল থেকে অনন্তকাকুর জ্বর। এবারে ধুলোর জন্য তাঁর হাঁচি শুরু হলো। কাকু ব্যস্ত হয়ে মুখে রুমাল চাপা দিলেন। নইলে ওঁর মুখ থেকে বাতাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোনো অসুখের জীবাণু চলে যাবে।

সুভাষ ক্লাসে এসে একথা বলল। শেষে জানতে চাইল বাতাসে আর কোন কোন রোগের জীবাণু থাকে।

দিদিমণি বললেন— অনেক রকম রোগের জীবাণু থাকে। তবে যক্ষ্মা বা টিবি রোগের জীবাণু খুব মারাত্মক। ফুসফুস দিয়ে আমরা শ্বাস নিই আর ছাড়ি। ফুসফুসেই যক্ষ্মা রোগ বেশি হয়। অন্য কয়েকটি অঙ্গেও হয়।

সুভাষ বলল— কী করে বোঝা যায় যে ফুসফুসে যক্ষ্মা হয়েছে?

— প্রথম প্রথম বিকেলে জ্বর হয়। রাতে ঘাম, শ্বাসকষ্ট হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর টানা কফ উঠতে থাকে। তারপর খাওয়ায় অরুচি, বুকে ব্যথা হয়। অসুখ একটু বাড়লে কাশির সঙ্গে কাঁচা রক্ত ওঠে। ক্রমশ ওজন কমতে থাকে।

— ওই কফ, হাঁচিতে রোগ ছড়ায়?

— হ্যাঁ। থুথু থেকেও ছড়ায়। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেও ছড়ায়। তবে মনে রেখো যক্ষ্মা বংশগত রোগ নয়।

— এই রোগ কতদিনে সারে?

— বছরখানেক হাসপাতালে DOT চিকিৎসা করাতে হয়। তাহলে এখন পুরো সেরে যায়। ষাট-সত্তর বছর আগেও এর ভালো চিকিৎসা ছিল না। যারা পারত তারা ভালো খাবার খেত। যেখানে বাতাসে দূষণ কম সেখানে বিশ্রাম নিত। তাতেও ঠিক সারত না। তবে মাঝপথে ওষুধ খাওয়া থামিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাতে যক্ষ্মা আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

সেবা বলল— কবে থেকে মানুষের এই রোগ হচ্ছে?

— সাত-আট হাজার বছর আগের মানুষের কঙ্কালেও এই রোগের জীবাণু পাওয়া গেছে।

রুনা বলল— তখন থেকেই যক্ষ্মার জীবাণুর কথা জানা ছিল?

—রোগটার কথা জানা ছিল। জীবাণু আবিষ্কৃত হয় প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে।

— তাহলে চিকিৎসা ষাট-সত্তর বছর আগে শুরু হলো কেন?

— কী দিয়ে একটা জীবাণু মারা যাবে তা জানা কি সহজ? কত পরীক্ষা করতে হয়! তার কী ফল হলো সেটা দেখতে হয়।

জলের সঙ্গে জীবাণু

তীর্থর খুব চিন্তা হলো। বাতাস থেকে যক্ষ্মার জীবাণু ওর শরীরে ঢুকে যায় যদি! একবছর ধরে ওষুধ খেতে হবে! তৃপ্তিমাসি নার্স। পাশের বাড়িতে থাকেন। একদিন মাসিকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করল। মাসি বললেন— জীবাণু সবার শরীরেই কমবেশি আছে। আবার শরীরের মধ্যেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও আছে।

— তাহলে লোকের যক্ষ্মা হয় কেন?

— অনেকে ধুলো-ধোঁয়া ভরা বাতাসে থাকেন। খুব পরিশ্রমও করেন। ঠিক মতো খান না। ফলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিকমতো গড়ে ওঠে না।

— আমার শরীরে প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়েছে?

— হয়েছে, তোমায় বিসিজি টিকা দেওয়া আছে!

আমি নিজে টিকা দিয়েছি।

এমন সময়ে স্বপ্নার মা এসে বললেন— মেয়ে কাল রাত থেকে বমি আর পায়খানা করছে। একেবারে ঘোলা জলের মতো।

তৃপ্তিমাসি বললেন— নুন-চিনির জল বারবার খাওয়ান। ওর শরীরে নুন আর জল কমে যাচ্ছে। আগে সেটা পূরণ করুন। জলটা কুড়ি মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এক গ্লাস ফোটানো জলে এক চামচ চিনি আর এক চিমটে নুন দেবেন। এটাই বাড়িতে তৈরি ওআরএস (ORS)। মাঝে মাঝে কয়েক চামচ করে খাইয়ে দেবেন। দূষিত জল পান করায় ওর এই বিপত্তি! তবে আঢাকা খাবার বা পানীয় খেলেও এমন বমি পায়খানা হতে পারে।

স্বপ্নার মা বললেন— দিদি, কলেরা নয়তো?

— পাতলা পায়খানা তো কত কারণেই হয়। কলেরায় পায়খানা হয় চাল ধোয়া জলের মতো। একটু আঁশটে গন্ধ থাকে। কাছে যাওয়া যায় না। ওষুধ না পড়লে বালতি বালতি বমি-পায়খানা হয়। এসব কিছু দেখলে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাবেন।

বলাবলি করে লেখো

বায়ু ও জলবাহিত জীবাণু থেকে তোমাদের বা বাড়িতে কার কী অসুখ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

অসুখের নাম	বায়ুবাহিত/জলবাহিত	রোগের লক্ষণ কী
১। টাইফয়েড		
২। পোলিও		
৩। নিউমোনিয়া		
৪। অ্যালার্জি		
৫। কৃমিঘটিত রোগ		
৬। মাম্পস		
৭। বাত		
৮। জল বসন্ত		

ওআরএস (ORS) কী কাজে লাগে, কীভাবে তৈরি করবে? ছবি এঁকে আর লিখে একটা পোস্টার তৈরি করো:

কেমনভাবে স্টেথোস্কোপ এল?

সিধু আর তিতির ডাক্তারকাকুর স্টেথোস্কোপটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিল। ওরা স্কুলে যে স্টেথোস্কোপগুলো বানিয়েছে সেগুলোর থেকেও এটা ভালো। ডাক্তারকাকু ওদের বললেন— স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের সঙ্গে একটা মজার গল্প জড়িয়ে আছে। গল্পের কথায় সিধু আর তিতির নড়েচড়ে বসল। কিন্তু একা একা গল্পটা শুনতে ওদের মন খারাপ হলো। বাকি বন্ধুরাও যদি শুনতে পেত গল্পটা তাহলে খুব মজা হতো। সেকথা ডাক্তারকাকুকে বলতেই তিনি একটা উপায় বার করলেন। ঠিক হলো এই শনিবার ডাক্তারকাকু ওদের স্কুলে যাবেন। ক্লাসের সবাইকে শোনাবেন স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের গল্প।

শনিবারে ডাক্তারকাকু স্কুলে এলেন। সবার বানানো স্টেথোস্কোপগুলো দেখলেন। খুবই ভালো বললেন। ওনার স্টেথোস্কোপটাও সবাই দেখল। তারপর ডাক্তারকাকু গল্পটা শুরু করলেন।

আজ থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগের কথা। রেনে লিনেক নামে একটি ছোটো ছেলে ছিল। সব জিনিস খুব খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস ছিল তার। বড়ো হয়ে লিনেক ডাক্তার হন। সবসময় ডাক্তারির নানা বিষয় নিয়ে ভাবতেন তিনি। একসময় ফুসফুস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন তিনি। তেমন একসময় একদিন বিকেলবেলা বাগানে পায়চারি করছেন লিনেক। হঠাৎ দেখলেন দুটি ছোটো ছেলে একটা মজার খেলা খেলছে। একটা ধাতুর নলে একদিকে একটা ধাতুর জিনিস দিয়ে আঁচড় কাটছে একজন। অন্যজন সেই ধাতুর নলটার অন্যদিকে কান লাগিয়ে সেই আঁচড়ের আওয়াজ শুনছে। এভাবে দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই খেলাটা খেলতে লাগল। একমনে ওদের খেলা দেখছিলেন লিনেক। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা ভাবনা এল।

দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন তিনি। টেবিলের ওপর পড়েছিল লম্বা একটুকরো মোটা কাগজ। কাগজটাকে গোল করে পেচালেন লিনেক। তা দিয়ে লম্বা, সরু একটা নল বানালেন। জুড়লেন আঠা দিয়ে। এভাবেই তৈরি হল প্রথম

স্টেথোস্কোপ। তবে কাগজের নল সহজে নষ্ট হয়ে যায়। আবার কাগজের ভিতর দিয়ে বুকের ধুকপুক শব্দ পুরোটা ভালো করে শোনাও যায় না। এবার ছুতোর ডাকলেন লিনেক। নিজের আঁকা স্টেথোস্কোপের নকশা ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। ছুতোর ফাঁপা, সরু কয়েকটা কাঠের নল বানিয়ে দিল। সেই একনলা স্টেথোস্কোপই ছিল আদি স্টেথোস্কোপ। তারপর আস্তে আস্তে তার চেহারা বদলাতে থাকে। এক সময় সেটা এসে দাঁড়াল আজকের স্টেথোস্কোপের চেহারায়।

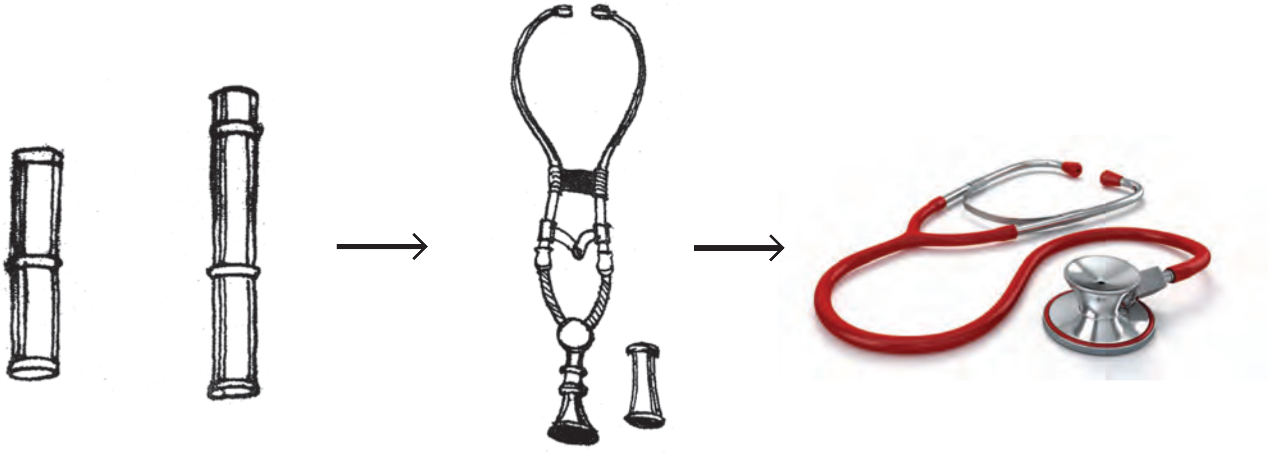

লিনেকের বানানো স্টেথোস্কোপ | প্রথম দু-নলা স্টেথোস্কোপ | আজকের স্টেথোস্কোপ

মাটির তলার মাটি

অজিতদের বাড়িতে টিউবওয়েল বসাচ্ছেন রতনকাকুরা। প্রথমে খানিকটা খুঁড়ে নিল। তারপর মাটিতে পাইপ বসানো শুরু হলো।

একটু পরেই অজিত দেখল পাইপের মুখ থেকে জল আর মাটি উঠছে। কাঁকর মাটি। বালি মাটি। মিহি মাটি।

ক্লাসে সেদিন মাটি নিয়ে কথা হচ্ছিল। অজিত কল বসানোর সময় দেখা মাটির কথা বলল। স্যার বললেন— কল বসানোর সময় তলার মাটি কেমন তা জানা যায়।

মিতা বলল— উপরের মাটি আর তলার মাটি কি আলাদা হয়?

— কিছুটা আলাদা তো হবেই। ওপরের মাটি মিহি। যত নীচের মাটি তত কাঁকর ও নুড়ি বেশি। গ্লাসে জল নাও। মাঠ থেকে

খানিকটা মাটি নিয়ে এসো। সেটা গ্লাসের জলে গুলে থিতিয়ে নাও। বুঝতে পারবে।

অজিত আগেই প্রশ্ন করল— কী দেখা যাবে, স্যার?

— এই মাটিতে ভারি ও হালকা নানা কিছু আছে। ভারি গুলো নীচে থিতিয়ে পড়বে ও হালকাগুলো ওপরে ভেসে উঠবে।

জলে মাটি গুলে থিতিয়ে সব দেখা হলো। তারপর অজিত বলল— উপরের মাটি গুলে দেখলেও এইরকম দেখা যাবে?

— অনেকটা একইরকম হবে। উপরের শুকনো মাটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখো।

রাবেয়া বলল— একইরকম হবে কেন? উপরের মাটিও কী এইরকম?

— মোটামুটি একইরকম হবে।

পরীক্ষা করে লেখো

কাছেপিঠে যে মাটির ঢেলা পাবে তা নিয়ে জলে গুলে পরীক্ষা করে লেখো। ভালো করে দেখো পর পর কী জমছে। তারপর পাশে লেখো :

একটা বড়ো কাচের গ্লাসে জল নিয়ে তাতে এক দলা মাটি গুলে দাও।

মাটি গোলার পর কী হয় দেখো। ঘণ্টা কয়েক পরে গ্লাসের উপরে ও পাশের দিকে দেখো। যা দেখছ তা আঁকো ও পাশে লেখো।

মাটি দেখা

পরদিন। স্যার বললেন— শুকনো মাটির দলা গ্লাসের জলে ফেলে কী দেখলে? এঁকে দেখাও তো!

সীমা বোর্ডে আঁকল। ছবিতে দেখাল, মাটির দলা জলে ফেলা আছে। তা থেকে বুজ বুজ করে বাতাস উঠেছে।

স্যার বললেন— বাঃ! মন দিয়ে দেখেছ তো! জলে গোলা মাটি থিতানোর পর কী ভাসছিল?

পরীক্ষা করে লেখো

জলে নানা জিনিস (লোহা, ইট ইত্যাদি) ফেলো। কী ঘটে দেখে পাশে লেখো: ⇒

জিনিসের নাম	কী ঘটল	কেন এমন ঘটল

রেহানা বলল— পাতার গুঁড়ো ছিল। গুঁড়ো চায়ের মতো। ফুলের পাপড়ির টুকরো, আরশোলার পা ছিল।

নবীন বলল— তুই কী করে বুঝলি কোনটা কী?

—আমার একটা লেন্স আছে। সেটা দিয়ে দেখলে বড়ো দেখায়।

—তাই বল ! আমি তো খালি চোখে দেখেছি।

এত কিছু তো বুঝিনি !

— লেন্স কিন্তু ইংরাজি কথা। বাংলায় বলে আতশকাচ। শুকনো মাটি নিয়ে দেখবে। যে যেখান থেকে পারো মাটি জোগাড় করো। মাটিটা ভালোভাবে ভাঙবে। তারপর ভালো করে দেখবে। তাতে কী কী আছে। দানাগুলোর আকার কেমন।

দেখে বুঝে লেখো

কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে মাটি এনে গুঁড়ো করে ভালো করে দেখে লেখো:

কোথাকার মাটি	কী দিয়ে দেখেছ	কী কী দেখেছ	সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়	দানাগুলোর আকার কেমন

মাটি দিয়ে পাকা বাড়ি!

সবাই মন দিয়ে মাটি দেখল। একটু করে শুকনো গুঁড়ো মাটি নিয়ে এল। কী দেখেছে তা লিখেও আনল। কিন্তু সবার দেখা একরকম হলো না। সমীরের আনা মাটি দেখে স্যার বললেন— এত শক্ত মাটি এমন মিহি করে গুঁড়ো করলে কীভাবে?

— মুগুর দিয়ে ভেঙেছি। তারপর হামানদিস্তা দিয়ে গুঁড়ো করেছি। ময়দার মতো হয়ে গেছে। আলাদা আলাদা কণা বোঝাই যাচ্ছে না।

— এই হলো কাদার কণা। কণাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটু জল আর বাতাস থাকে। জল শুকোলে কণাগুলো গায়ে গায়ে লেগে শক্ত হয়ে যায়।

— ভাঙা খুব কঠিন! গুঁড়ো করে জল দিলেই আঠার মতো, যেন সিমেন্ট!

হরিশ বলল— তাহলে লোকে আর সিমেন্ট কিনবে না। এই মাটি দিয়েই পাকা বাড়ি গাঁথবে!

— আগে তাই করত। ওইরকম কাদায় মিহি বালি মিশিয়ে তাই দিয়ে ইট গাঁথত।

— এখনও তেমন বাড়ি আছে?

— অনেক বাড়ির একতলাই ওভাবে গাঁথা। তখন সিমেন্ট তেমন পাওয়া যেত না।

হরিশ বলল— সিমেন্ট পাওয়া যেত না? সে কত বছর আগে?

— সিমেন্ট প্রথম হয়েছে প্রায় দুশো বছর আগে। এদেশে তৈরি শুরু হয়েছে প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে। আর বেশি ব্যবহার হচ্ছে সত্তর-আশি বছর হলো। তারপর একটু থেমে বললেন— এটা এঁটেল মাটি। এতে জল দিলে ঠিক কী হয় দেখতে হবে।

রাবেয়া নিজের আনা মাটির কিছু কণা দেখিয়ে বলল— মাটির এই কণাগুলো বেশ বড়ো বড়ো। খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছে।

— এগুলো বালির কণা। কাদার কণার চেয়ে বড়ো। এই মাটিকে বলে বেলে মাটি। এতেও আমরা জল দিয়ে দেখব।

মিনতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল— স্যার, আমার আনা মাটির খানিকটা

জলে গুললাম। ভালো করে থিতাল না। জলটা ঘোলাই রয়ে গেল।

মাটি দেখে স্যার বললেন— এটা দোঁয়াশ মাটি। বালি আর কাদা প্রায় সমান সমান। কিছুটা জৈব পদার্থ আর মাটির

নানা অস্বাভাবিক উপাদানও এতে আছে।

— গোবর, মাছের কাঁটা, পচাপাতার কুচি, এগুলো তো জৈব পদার্থ। মাটির অস্বাভাবিক উপাদান কী?

— এই দেখো। পলিথিনের কুচি। অ্যালুমিনিয়ামের কুচি। পেনের রিফিলের টুকরো। পেনসিলের শিস। স্যার আতশ কাচ দিয়ে মিনতিকে এইসব দেখালেন। তারপর বললেন— এর কিছু জলে ডোবে। আবার কিছুটা ভাসে বা আধ-ডোবা হয়ে থাকে। জৈব পদার্থও তাই। সেজন্য জলে এই মাটি গুললে থিতানো মুশকিল।

পরীক্ষা করে লেখো

তোমার বাড়ির কাছাকাছি জায়গার শুকনো মাটি নাও। পরীক্ষা করে ওই মাটির উপাদান বিষয়ে লেখো:

তোমার ঠিকানা	কীভাবে গুঁড়ো করেছ	কী উপাদান দেখেছ	
		স্বাভাবিক উপাদান	অস্বাভাবিক উপাদান

মাটি ও জলের বোঝাপড়া

স্যার ক্লাসে এলেন। হাতে একটা ব্যাগ। তা থেকে একটা পলিথিনের কৌটো বের করলেন। তার মুখটা খোলা। কৌটোর পিছনদিকটা দেখালেন। অনেকগুলো ফুটো।

এবার একটা ফিল্টার পেপার বের করে কৌটোটার তলায় বিছিয়ে নিলেন।

তারপর বললেন—এটার ভিতর দিয়ে জল গলে যাবে, মাটির কণারা যাবে না। তারপর সমীরের আনা এক কাপ মাটি ঢাললেন। কৌটোটা একটা কাচের গ্লাসের উপর বসালেন। বললেন—সমীর, এর উপর জল ঢাললে। কী দেখা যাবে বলো?

সমীর বলল—মাটিটা ভিজবে। আর খানিকটা জল চুঁইয়ে নীচের গ্লাসে পড়বে।

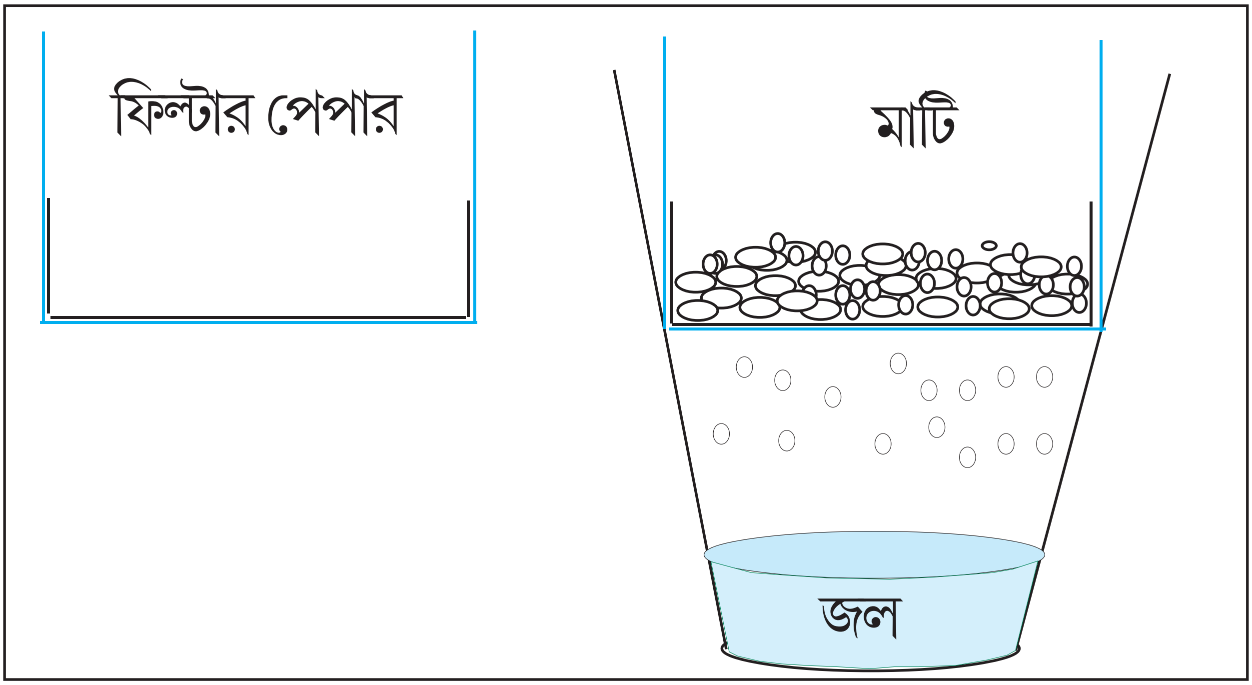

রাবেয়া বলল— স্যার, আর দুটো কৌটো দেবেন? আমি আর মিনতি যে মাটি এনেছি তাতেও জল ঢালব।

স্যার আরও দুটো কৌটো, ফিল্টার পেপার দিলেন। রাবেয়া আর মিনতি সেই কৌটোগুলোর তলায় ফিল্টার পেপার বিছিয়ে নিল। তারপর নিজেদের আনা মাটি এক কাপ করে ঢালল।

স্যার বললেন—এবার যে যা মাটি এনেছ তার উপর দু-কাপ করে জল ঢালো। তারপর দেখো কী হয়।

ওরা সবাই খুব সাবধানে জল ঢালল। স্যার বললেন— ভালো করে দেখো। কোন কৌটো থেকে আগে জল পড়া শুরু হয়। কোনটা থেকে বেশিক্ষণ ধরে জল পড়ে। আর কোনটা থেকে নীচের গ্লাসে বেশি জল জমে। তারপর যা দেখলে তা লেখো। আর তা থেকে কী কী বোঝা গেল তাও লেখো।

পরীক্ষা করে লেখো

সমীর, রাবেয়া আর মিনতির মতো করে এঁটেল, বেলে আর দোআঁশ মাটি নিয়ে পরীক্ষা করো। কী দেখেছ আর কী বুঝেছ লেখো। কীভাবে পরীক্ষা করেছ তা এঁকে দেখাও:

আগে জল পড়া শুরু হয়	বেশিক্ষণ ধরে জল পড়ে	নীচের গ্লাসে বেশি জল জমে	বোঝা গেল (এঁটেল/ বেলে / দোআঁশ: যেটা ঠিক সেটা লেখো)
			তাড়াতাড়ি জল বেরিয়ে যায় ______ মাটি থেকে। ভিজতে বেশি সময় লাগে ______ মাটির। বেশি জল বেরিয়ে যায় ______ মাটি থেকে। বেশি জল ধরে রাখতে পারে ______ মাটি।

পরীক্ষার ছবি আঁকো :

উপকার, অপকার : যত্ন ও পুষ্টি

সুধাময় দেখল মাটিতে সুতোর মতো কীসব রয়েছে। তবে সুতো নয়। স্যারকে দেখাল। দেখেই স্যার বললেন—এত কেঁচো। মাটিটা রোদে শুকিয়েছে। এরা মরে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে।

মিনতি বলল— স্যার, ওগুলো তো মাটির স্বাভাবিক উপাদান?

—হ্যাঁ। কেঁচো মাটির সজীব জৈব উপাদান। এমন আরও অনেক ছোটো ছোটো জীব মাটিতে থাকে। কিছু খালি চোখে, কিছু আতশকাচ দিয়ে দেখা যায়। এছাড়াও এমন অনেক জীবাণুও

মাটিতে থাকে যাদের এভাবেও দেখা যায় না। এরা সবাই মাটির মৃত জৈব উপাদানকে ভাঙতে সাহায্য করে। তার ফলে মাটি উর্বর হয়।

রিয়াজ বলল - সার দিলেও তো মাটি উর্বর হয়। নাইট্রোজেন সার, ফসফেট সার, কম্পোস্ট সার ।

—সার থেকে বিভিন্ন উপাদান নেয় গাছ। সব সারের মধ্যে অনেক উপাদান একসঙ্গে থাকে। তার মধ্যে থেকে গাছ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এসব উপাদান বেছে নেয়।

— তাতে মাটির সজীব উপাদান কীভাবে সাহায্য করে?

তপন বলল —কম্পোস্ট তো জৈব সার। অনেক ভাঙলে তবে গাছ নাইট্রোজেন, ফসফরাস পাবে। মাটির ভিতরের ছোটো ছোটো জীব এবং জীবাণুরা সেই কাজে সাহায্য করে। আধপচা পাতা ভাঙতেও সাহায্য করে।

স্যার বললেন—ঠিক বলেছ! কিন্তু তুমি এত জানলে কী করে?

— আমাদের জৈব সারের দোকান আছে। বাবা আলোচনা

করছিল। আমি শুনে, বুঝে নিয়েছি। আগে জৈব সারই ছিল। রাসায়নিক সার অনেক পরে এসেছে।

মিনতি বলল— পলিথিন, প্লাস্টিক এগুলো কীভাবে ভাঙে?

— ভাঙে না। ওগুলো মাটিকে আলো-হাওয়া পেতে দেয় না। গাছের শিকড়গুলোকে মাটিতে ঢোকার সময় বাধা দেয়।

— শিকড় মাটিতে ঢুকতে না পারলে মুশকিল! ঝড়ে গাছ উলটে যাবে।

রিয়াজ বলল— ওগুলো মাটির শত্রু। বেছে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে হবে। দেখতে হবে, আবার যেন না উড়ে যায়। আর পলিথিনের ব্যবহারও কমাতে হবে।

বলাবলি করে লেখো

মাটি ভালো রাখা বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

মাটির উপকারী উপাদান	
কীভাবে উপকার করে	
মাটির ক্ষতিকর উপাদান	
কীভাবে ক্ষতি করে	
উপকারী উপাদান বাড়াতে আর ক্ষতিকর উপাদান কমাতে আমরা কী কী করব	

মাটি থেকেই সোনার ধান

আমন ধান রোয়ার জন্য জমিতে একটু জল দাঁড়াতে হয়। ধানের ছোটো চারা বীজতলা থেকে তুলে বসানো হয়। তবে আউশ ধানের জন্য বীজতলা দরকার হয় না।

রোয়ার আগে মাটিটা কাদা করতে হয়।

টানা বৃষ্টি হলে নীচু জমিতে জল দাঁড়ায়। তখন বীজতলা থেকে বীজধান উপড়ে রুয়ে দেয়।

অপর্ণা চাষের কাজ দেখেনি। তাই বলল— বীজধান মানে কী?

সমীর বলে দিল—প্রথমে ছোটো জায়গায় ধান ছড়াতে হয়। এটা বীজতলা। ঘন হয়ে ছোটো ছোটো চারাগাছ বের হয়। সেই গাছগুলোকে বলে বীজধান। হাতখানেক হলে সেগুলো তুলে বসাতে হয়। বিঘতখানেক অন্তর সারি দিয়ে বসায়। সেই চারা বসানোকে বলে রোয়া।

স্যার বললেন— তাই যে মাটি সহজে কাদা করা যায় তাতেই সহজে জল জমে। সেখানেই ধান রোয়া যায়। সেই মাটিই ধান চাষের জন্য ভালো।

পরীক্ষা করে লেখো

তোমার কাছাকাছি যেখানে ধান চাষ হয়, সেখান থেকে কিছুটা মাটি সংগ্রহ করো। সেই মাটি কী ধরনের তা পরীক্ষা করে কী পেলে তা লেখো। কীভাবে পরীক্ষা করলে তার ছবি আঁকো ও লেখো: